বাংলাদেশে ভূমিকম্প বিষয়ক ঝুঁকি ও করণীয়

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায়শই মৃদু থেকে মাঝারি ভূকম্পন অনুভূত হচ্ছে। ঘনবসতিপূর্ণ এদেশে বড় কোনো ভূমিকম্প যে বিশাল দুর্যোগ বয়ে নিয়ে আসবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিরোনামে প্রস্তুতি ও করণীয় বলতে মূলত ব্যক্তিগত প্রস্তুতির কথাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রচারণা, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কাজে রাষ্ট্র এবং নগর কর্তৃপক্ষগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকম্পের সাথে অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির মধ্যে একটি বড় পার্থক্য হচ্ছে এটি খুব কম সময়ে কোনো ধরনের পূর্বাভাস ছাড়াই সম্পন্ন হয় (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অবশ্য টর্নেডো পূর্বাভাসও দেয়া হয় না)। প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে ভূমিকম্প বিষয়ে তাই ব্যক্তিগত পূর্বপ্রস্তুতি ও করণীয় সম্পর্কে ধারণালাভ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

ভূমিকম্প ঝুঁকি

নিজ এলাকায় ভূমিকম্প ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা রাখাও প্রস্তুতির একটা অংশ। ভূমিকম্প ঝুঁকি অনুযায়ী ভূ-তাত্ত্বিকভাবে বাংলাদেশকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। সিলেট বিভাগসহ নেত্রকোনা, শেরপুর, কুড়িগ্রাম জেলা এবং ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, গাইবান্ধা, রংপুর ও লালমনিরহাট জেলার অংশবিশেষ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মধ্যে রয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ইত্যাদি জেলা মাঝারি ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় পড়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সর্বশেষ সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল ১৯১৮ সালে তৎকালীন শ্রীমঙ্গল বা সিলেট অঞ্চলে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৬ । এছাড়া,১৮৯৭ এবং ১৯৫০ সালে আসামে যে বিশাল ভূমিকম্প হয় তা ছিল সিলেট সীমান্ত থেকে খুব কাছেই। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের খুব কাছে ডাউকি ফল্ট (ম্যাপ) এবং ইউরেশিয়া-ইন্ডিয়ান প্লেটের সংযোগস্থলের অবস্থান হওয়ায় এ অঞ্চল ভূমিকম্পের জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ।

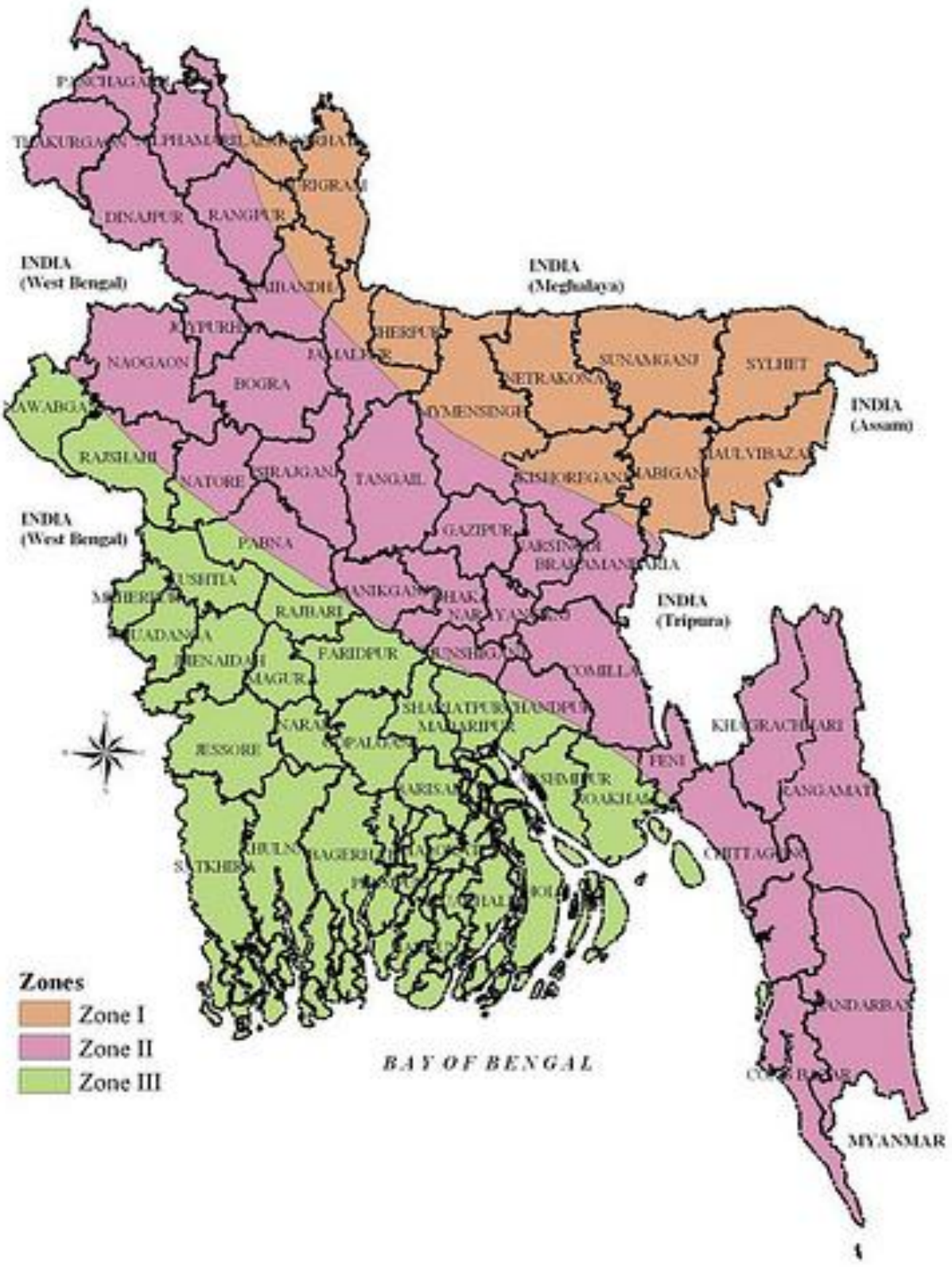

চিত্রঃ ভূমিকম্প ঝুঁকি অঞ্চল

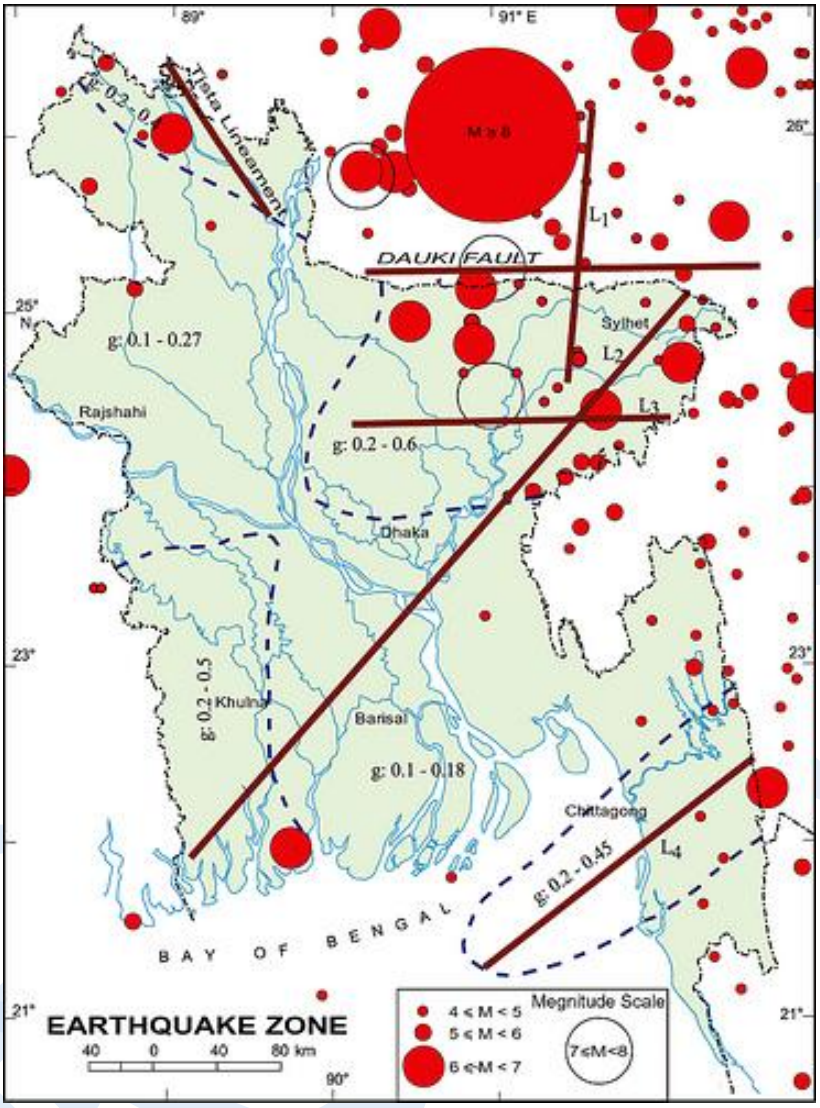

চিত্রঃ বিভিন্ন এলাকায় সম্ভাব্য ভূমিকম্প মাত্রা (উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ডাউকি ফল্ট)

১৮৮৫ সালে ঢাকার কাছে মানিকগঞ্জে বিশাল একভূমিকম্প হয়েছিল (আনুমানিক ৭ থেকে ৮ মাত্রার) যা ইতিহাসে'বেঙ্গল আর্থকোয়েক' নামে পরিচিত। এখন যদি ঢাকায় এ ধরনের কোনো ভূমিকম্প হয়, তবে অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। চট্টগ্রামেও ১৭৬২ সালে চট্টগ্রাম-আরাকান সীমান্তে একটি বড় ভূমিকম্প হয়েছিলো। সাম্প্রতিককালে, চট্টগ্রামে ১৯৯৭ সালে ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্পে ৫ তলা বাড়ি ধসে ২৩ জন নিহত হয়েছিল।

ভূ-তাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী ঢাকাকে চারটি ভূমিকম্প ঝুঁকি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। নিচে সাদাকালো প্রথম মানচিত্রটি ডেইলি স্টারে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের

অধ্যাপক ড. আফতাব আলমখানের কলাম থেকে নেয়া এবং দ্বিতীয়টি করেছেন সচলায়তন সদস্য ভূ-তত্ত্ববিদ মুহম্মদ শাহাদাত হোসেন ওরফে দ্রোহী। ম্যাপ অনুযায়ী উত্তরা সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং খিলগাঁও, বাড্ডা, গুলশান, ক্যান্টনমেন্ট বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় রয়েছে। দু'টো ম্যাপের মধ্যে অবশ্য হাল্কা কিছু পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয় মানচিত্রে পুরানো ঢাকা পুরোপুরি মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ দেখানো হলেও প্রথম মানচিত্রে বুড়িগঙ্গা সংলগ্ন অঞ্চল বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় চিহ্নিত হয়েছে। একইভাবে মিরপুর এলাকার বেশিরভাগ প্রথম মানচিত্রে মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ দেখানো হলেও দ্বিতীয়টিতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দেখানো হয়েছে। মানচিত্রে চলক ব্যবহারে ভিন্নতার কারণে এ ধরনের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক

Fig. 13— Earthquake hazard map of Dhaka city.

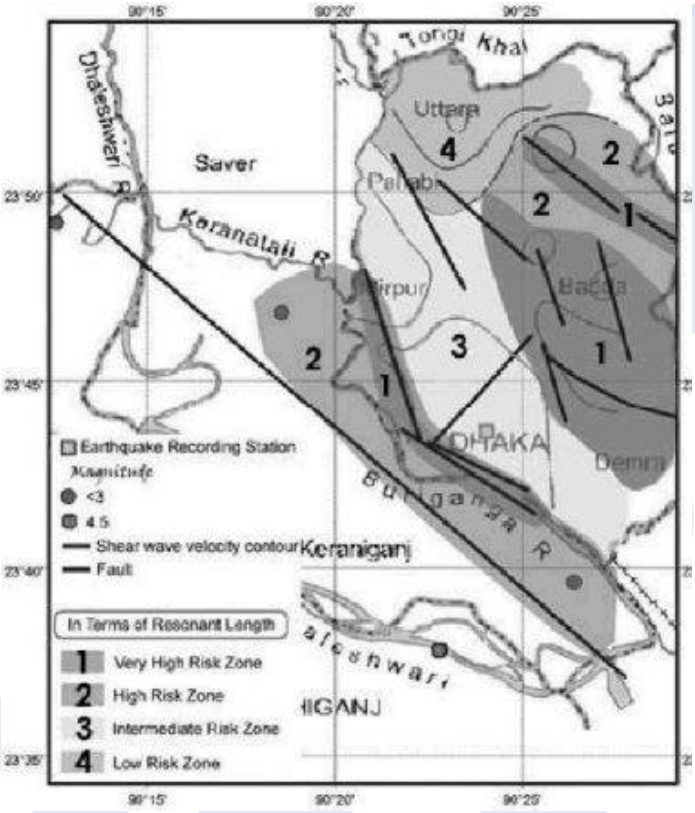

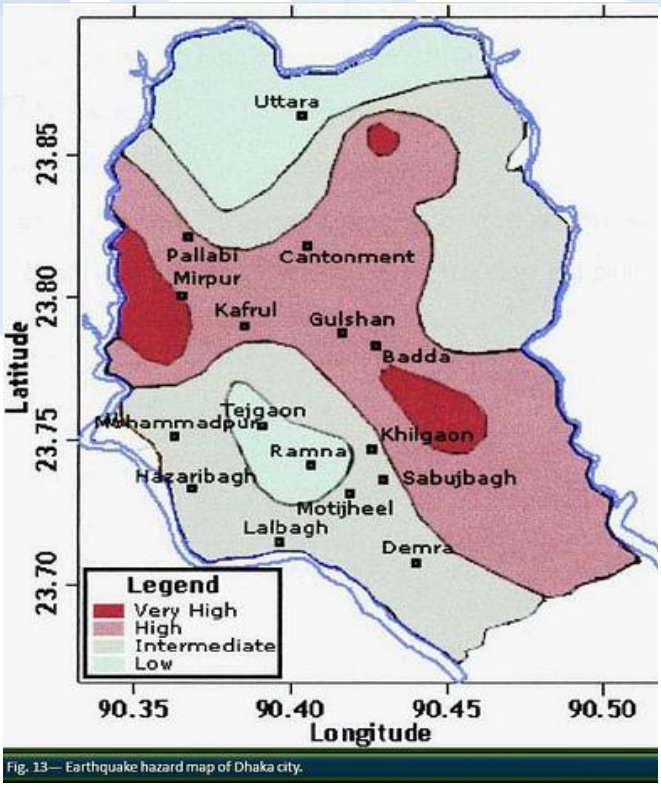

ঢাকার ভূমিকম্প ঝুঁকি
(ড. আফতাব আলম খান)

ঢাকার ভূমিকম্প ঝুঁকি
(দ্রোহী)

ভূমিকম্পের তীব্রতা বা ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দালানকোঠার নির্মাণ, গঠন, উপাদান, উচ্চতা ইত্যাদির ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। অনেক সময় ভূকম্পনের দোলনের সাথে ভবনের দোলনের যদি অনুরণন ঘটে তবে পুরো বাড়ি ভেঙে পড়তে পারে। ১৯৮৫ সালে মেক্সিকো সিটির ভূমিকম্পে ৬-১৫

তলা ভবনগুলোর দোলনের সাথে ভূকম্পনের সর্বোচ্চ মাত্রার দোলনের সমাপতন বা অনুরণন ঘটেছিল। তাই এ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ বেশিরভাগ (৬০%) ভবনের উচ্চতা ছিলো ৬-১৫ তলা। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন উচ্চতার ভবনের একটি অনুরণন মানচিত্র দ্রোহী তৈরী করেছিলেন।

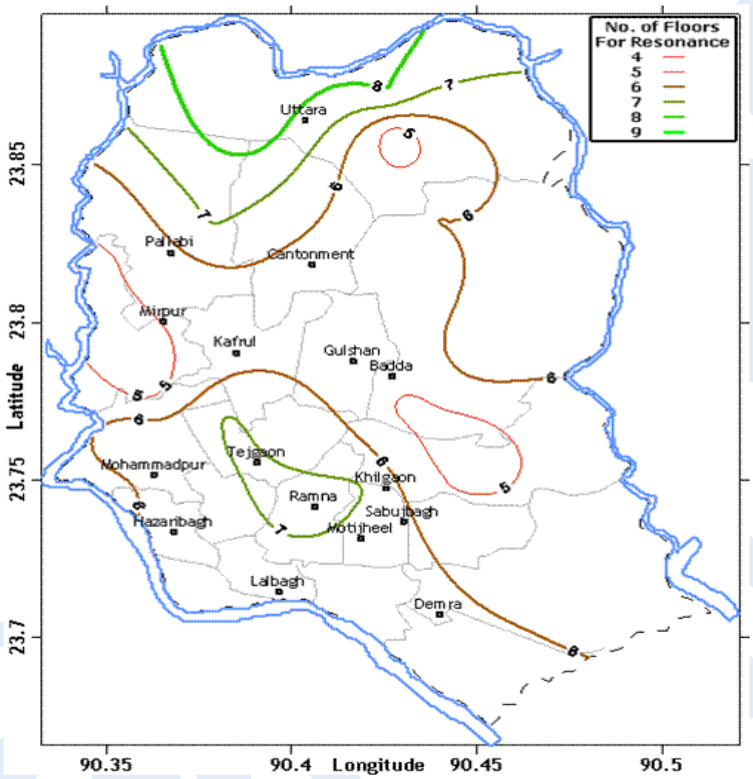

অনুরণন চিত্র (দ্রোহী)

<u>প্রস্তুতি</u>

• আপনি যদি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় থাকেন তবে খোঁজ নিন আপনার ভবনটিতে ভূমিকম্পরোধক ব্যবস্থা আছে কিনা, থাকলে তা কী মাত্রার ভূমিকম্প সহ্য করতে পারবে। যদি না থাকে তবে রেট্রোফিটিং-এর ব্যবস্থা নিন। কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পুরনো ভবনেও রেট্রোফিটিং-এর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। জাপানে ভূমিকম্প একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু তাদের ভবনগুলিতে ভূমিকম্পরোধক ব্যবস্থা থাকায় তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয় অতি সামান্য।

• পরিবারের সবার সাথে বসে এ ধরণের জরুরী অবস্থায় কি করতে হবে, কোথায় আশ্রয় নিতে হবে- মোট কথা আপনার পরিবারের ইমার্জেন্সি প্ল্যান কী সেটা ঠিক করে সব সদস্যদের জানিয়ে রাখুন। ভূমিকম্পের সময় হাতে খুব সামান্যই সময় পাওয়া যাবে। এ সময় কী করবেন তা সবাইকে নিয়ে আগেই ঠিক করে রাখুন।

• বড় বড় এবং লম্বা ফার্নিচারগুলোকে যেমন- শেলফ ইত্যাদি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখুন যেন কম্পনের সময় গায়ের উপর পড়ে না যায়। আর টিভি, ক্যাসেট প্লেয়ার ইতাদি ভারী জিনিষগুলো মাটিতে নামিয়ে রাখুন।

• বিছানার পাশে সবসময় টর্চলাইট, ব্যাটারী এবং জুতো রাখুন।

• বছরে একবার হলেও ঘরের সবাই মিলে আসলভুমিকম্পের সময় কী করবেন তার একটা ট্রায়াল দিন।

<u>ভূমিকম্পের সময় করণীয়</u>

নিচের পরামর্শগুলো আপনার ভবনে ভূমিকম্পরোধক ব্যবস্থা আছে তা ধরে নিয়ে দেয়া।

১। ভূমিকম্পের সময় বেশি নড়াচড়া, বাইরে বের হবার চেষ্টা করা, জানালা দিয়ে লাফ দেবার চেষ্টা ইত্যাদি না করা উত্তম। একটা সাধারণ নিয়ম হল- এসময় যত বেশি মুভমেন্ট করবেন, তত বেশি আহতহবার সম্ভাবনা থাকবে। আপনার ভবনে যদি ভূমিকম্পরোধক ব্যবস্থা থাকে বা রেট্রোফিটিং করা থাকে তবে ভূমিকম্পের সময় বাসায় থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ।

২। আমেরিকান রেডক্রসের পরামর্শ অনুযায়ী- ভূমিকম্পের সময় সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল ‘ড্রপ-কাভার-হোল্ড অন’ বা ‘ডাক-কাভার’ পদ্ধতি। অর্থাৎ কম্পন শুরু হলে মেঝেতে বসে পড়ুন, তারপর কোন শক্ত টেবিল বা ডেস্কের নীচে ঢুকে কাভার নিন, এমন ডেস্ক বেছে নিন বা এমনভাবে কাভার নিন যেন প্রয়োজনে আপনি কাভারসহ মুভ করতে পারেন। তাদের মতে, কোনো ভবন ভূমিকম্পরোধক হলে তা খুব কমই ধসে পড়ে; যেটা হয় তা হল আশেপাশের বিভিন্ন জিনিষ বা ফার্নিচার গায়ের উপর পড়ে নেক-হেড-চেস্ট ইনজুরি বেশি হয়। তাই এগুলো থেকে রক্ষার জন্য কোন শক্ত ডেস্ক বা এরকম কিছুর নীচে ঢুকে কাভার নেয়া বেশি জরুরী।

৩। ভূমিকম্পের সময় এলিভেটর/লিফট ব্যবহার পরিহার করুন।

৪। ভূমিকম্পের সময় যদি গাড়িতে থাকেন তবে গাড়ি বন্ধ করে ভেতরে বসে থাকুন। গাড়ীর বাইরে থাকলে আহতহবার সম্ভাবনা বেশি।

৫। 'মেইন শক বা মূল ভূমিকম্পের আগে এবং পরে মৃদু থেকে মাঝারি আরো কিছু ভূমিকম্প হতে পারে যেগুলো 'ফোরশক' এবং 'আফটার শক নামে পরিচিত। সতর্ক না থাকলে এগুলো থেকেও বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে। সাধারণত কোনো বড় ভূমিকম্পে 'আফটার শক প্রথম ঘণ্টার মধ্য থেকে শুরু করে কয়েক দিনের মধ্যে হতে পারে। ছবিতে একটা বড় ভূমিকম্পের শকের প্যাটার্ন দেখানো হয়েছে।

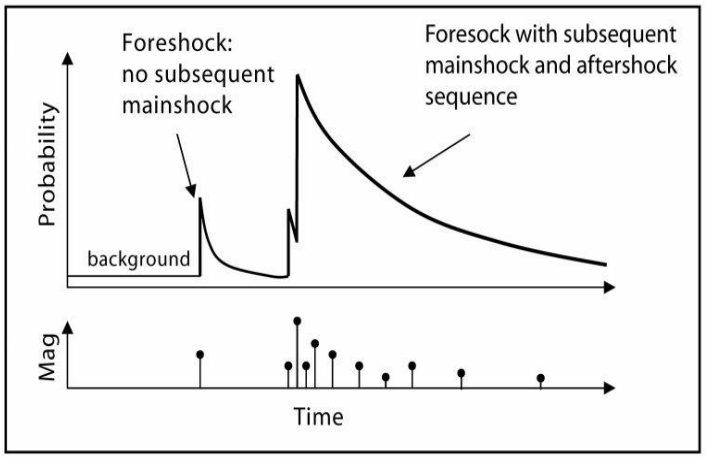

৬। প্রথম ভূমিকম্পের পর ইউটিলিটি লাইনগুলো (গ্যাস, বিদ্যুত ইত্যাদি) একনজর দেখে নিন। কোথাও কোন লিক বা ড্যামেজ দেখলে মেইন সুইচ বন্ধ করে দিন।

ধ্বংসস্তুপে আটকে পড়লে করণীয়-

১। ধুলাবালি থেকে বাঁচার জন্য আগেই সাথে রুমাল বা তোয়ালে বা চাদরের ব্যবস্থা করে রাখুন।

২। ম্যাচ জ্বালাবেন না। দালান ধ্বসে পড়লে গ্যাস লিক হয়ে থাকতে পারে।

৩। চিৎকার করে ডাকাডাকি শেষ অপশন হিসেবে বিবেচনা করুন। কারণ, চিৎকারের সময় মুখে ক্ষতিকারক ধুলাবালি ঢুকে যেতে পারে। পাইপে বা ওয়ালে বাড়ি দিয়ে বা মুখে শিস বাজিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে পারেন। তবে ভাল হয় সাথে যদি একটা রেফারির বাঁশি বা হুইসেল থাকে, তার প্রিপারেশন নিয়ে রাখুন আগেই।

ভূমিকম্পের সময় আসলে কতটুকু সময় পাবেন?

ভূমিকম্পের সময় প্রথম যে কম্পন টের পাওয়া যায় তা হলো প্রাইমারি ওয়েভ বা P-wave. এর গতিবেগ ১-১৪ কিমি/সে পর্যন্ত হতে পারে। এরপর আসে সেকেন্ডারি ওয়েভ বা Shear wave যার গতিবেগ ১-৮ কিমি/সে। এ দু'টো বডি ওয়েভ (চিত্র)। এছাড়া লাভ এবং রেলেই নামে আরো দু'টো ওয়েভ আছে যেগুলো সারফেস ওয়েভ এবং তুলনামূলকভাবে শ্লথগতিসম্পন্ন।

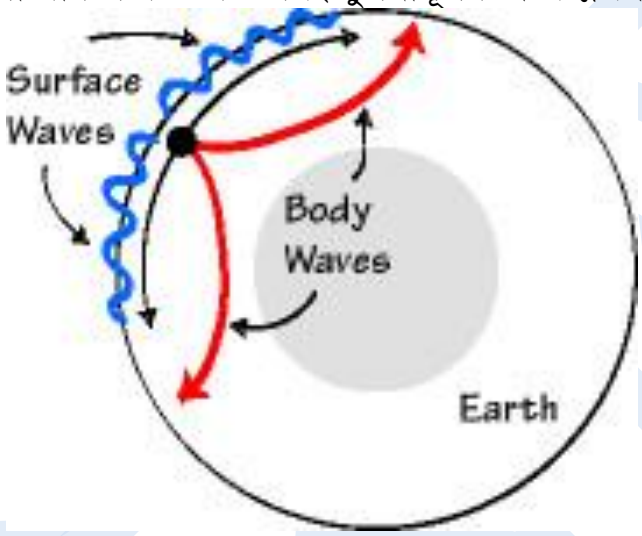

আমরা ভূমিকম্পে যে ঘরবাড়ি, অবকাঠামো ধ্বংস হতে দেখি তার জন্য মূলত দায়ী সেকেন্ডারি ওয়েভ এবং সারফেস ওয়েভগুলো- কারণ, এগুলোই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। এখন প্রাথমিক ভূ-কম্পন বা P-wave টের পাবার কতো সময় পর বাকিগুলো টের পাবেন? উত্তর হচ্ছে ব্যবধান খুব সামান্য। ধরুন আপনার অবস্থান ভূমিকম্পের এপিসেন্টার বা উৎপত্তিস্থল থেকে ২০০ কিমি দূরে। সেকেন্ডে যদি ১৪ কিমি বেগে P-wave আসে তবে ২০০ কিমি অতিক্রম করতে সময় নেবে প্রায় ১৪ সেকেন্ড। আর এরপর ৮ কিমি/সে বেগে সেকেন্ডারি ওয়েভ আসতে সময় নেবে প্রায় ২৫ সেকেন্ড। অর্থাৎ আপনি ভূমিকম্প টের পাবার মোটামুটি ১১ সেকেন্ডের ব্যবধানে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে। এর মধ্যেই আপনাকে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

পুনশ্চঃ এ লেখাটি ভূমিকম্পে কী করণীয়/জীবন রক্ষার টিপস পোস্ট থেকে পরিমার্জন ও হালনাগাদ করা হয়েছে। ভূমিকম্পের খুঁটিনাটি নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখার জন্য পুরনো পোস্ট দ্রষ্টব্য। যাঁরা সে পোস্টটিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, চিত্র ইত্যাদি যোগ করেছেন (বিশেষ করে দ্রোহী, শামীম ভাই) এবং প্রশ্ন করে সাহায্য করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

সূত্রঃ তানভীর- সচলায়তন